শ্রমণ

ISSN: 0975-8550

২৭তম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।। জৈষ্ঠ্য ১৪৩১

শ্রমণ ॥ ২৭ তম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ মে ২০২৪

Shraman May 2024 ISSN : 0975-8550

সূচীপত্র

1.	সম্পাদকীয়		2
2.	জৈন মতে অরিহন্ত কে?	ডঃ মুহাম্মদ তানিম নওশাদ	3
3.	Ahimsa in Indian Culture	Ajoy Tantubay	6
4.	জৈন ধারার কথা	সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	13
5.	आओ, चलो लौट चलें	सुखमय माजी	18
6.	আগম পাঠ: ভগবতীসূত্র	শ্রীকান্ত জৈন	27

॥ जैन भवन ॥

প্রকাশক

জৈন ভবন

পি-25, কলাকার স্ট্রীট, কোলকাতা -700007

সম্পাদকীয়

বাংলায় জৈন ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের জগতে 'শ্রমণ'কে অন্যতম পুরোধা বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা ভাষায় যাঁরাই জৈন ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের সবার কাছে 'শ্রমণ' পত্রিকা এবং 'জৈন ভবন' সম্পদের আকর রূপে কাজ করেছে।

সম্প্রতি 'শ্রমণ' নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে; আপাততঃ 'ত্রৈমাসিক-পত্রিকা'-রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে মুদ্রিত কপির সংখ্যা সীমিত রাখতে হওয়ায় এবং ডাকযোগে গ্রাহকের কাছে প্রেরণের বিষয়ে কিছু অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা থাকায় জৈন ভবনের website-এ এর digital সংস্করণ রাখা হচ্ছে, যাতে যে কেউ যে কোন সময় এ'টি পড়তে পারেন।

আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে 'শ্রমণ' আজ প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বহু বিশিষ্ট বিদ্বানের রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে 'শ্রমণ'। কিন্তু দেশের পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে আমরা আরও একটু সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। নতুন এক পরীক্ষা হিসেবে এবারের সংখ্যাটি ত্রৈভাষিক রূপে প্রকাশ করা হল। এ বিষয়ে পাঠকের মতামত আহ্বান করছি।

আমরা লেখকের স্বাধীনতা, পাঠকের স্বাধীনতা এবং সম্পাদকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে লেখকের লেখা সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জনে আমরা প্রবৃত্ত হই না। স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রকাশিত সব লেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব; সম্পাদকমণ্ডলী বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব নেবেন না। কোন বিষয়ে পাঠকের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া এলে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সেই প্রতিক্রিয়া পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশ করব। যে কেউ শ্রমণে লেখা পাঠাতে পারেন। অর্থনৈতিক কারণেই লেখককে কোন সম্মান দক্ষিণা দিতে আমরা অপারগ, তবে সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য থাকবে না। মুদ্রণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমে অপ্রকাশিত মৌলিক লেখাই একমাত্র বিবেচিত হ'বে। সকলকে নমস্কার ও অভিনন্দন। জয় জিনেন্দ্র।

ডঃ লতা বোথরা
সম্পাদক

জৈন মতে অরিহন্ত কে?

ডঃ মুহাম্মদ তানিম নওশাদ
ঢাকা, বাংলাদেশ।

জৈন মতে অরিহন্ত এক বিশেষ ব্যক্তি। তিনি সেই জীব বা আত্মা কিংবা জীবাত্মা যিনি সাধনার বলে তার অন্তর্গত চারটি বাসনাকে ধ্বংস করেছেন; যথা: পরিগ্রহ বা সংস্পর্শ, ঘৃনা, অহঙ্কার এবং লোভ। এই চার শত্রুবৎ কর্মকে (ঘাতী কর্ম) ধ্বংস করে তিনি নিজেকে পূর্ণরুপে জেনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। অরিহন্তকে তাই অভিহিত করা হয় 'কেবলী' বলে, কারণ তিনি নিজেকে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমগ্র জগৎকে জেনে সর্বজ্ঞানী হয়েছেন। জৈন মতে এই সমগ্র জগৎকে ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুকে সম্যক রূপে জানা এবং সর্বকালে এসব কিছুর অস্তিত্ব ও অবস্থাকে একই সময়ে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়াকে বলা হয় 'কেবল জ্ঞান'। তাই 'কেবল জ্ঞান' আদতে সম্যক, পরিপূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞান। তিনি আত্মা এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল জ্ঞান রাখেন। এই সম্যক, পরিপূর্ণ ও অনন্ত জ্ঞান লাভের কারণে অরিহন্ত নিজেকে ও সমগ্র জগৎকে জয় করেন। তাই অরিহন্ত জৈন শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধুদের কাছে 'জিন' অভিধায় বিভূষিত হন। ফলে এক অর্থে কেবলীর কোন মৃত্যু নেই। কিন্তু পৃথিবীতে একটি দেহ ধারণের কারণে তাঁর একটি পার্থিব জীবন কাল আছে। সেই সময়ের মধ্যে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে পার্থিব আয়ু শেষ করার আগেই তিনি তাঁর সমস্ত পার্থিব কর্মকে ধ্বংস করে মোক্ষ অর্জন করেন এবং পরিণত হন এক 'সিদ্ধ'তে। অরিহন্ত এক শরীরি অস্তিত্ব, কারণ তার একটি পার্থিব শরীর বা কায়া আছে। কিন্তু একজন সিদ্ধ, যিনি সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তার কোন শারীরিক বা কায়িক অবয়ব ও অস্তিত্ব থাকে না। একজন সিদ্ধ প্রকৃতার্থে এক অশরীরী পূর্ণ আত্মা। তিনি জীবন-মৃত্যুর চক্রকে ছেদ করেছেন। জৈন ধর্মের মহাপবিত্র মন্ত্র যেটি নমোকারা মন্ত্র নামে সুপরিচিত তা পঞ্চ-পরমস্তির প্রতি নিবেদিত। এই পাঁচ পরম অস্তিত্ব হচ্ছেন -

১. অরিহন্ত যিনি কেবলজ্ঞান অর্জন করে জিতেন্দ্রিয়, জিনেন্দ্র ও বিশ্বজয়ী হয়েছেন।

২. সিদ্ধ বা অশরীরী যিনি মোক্ষ অজর্ন করেছেন এবং জীবন-মৃত্যুর চক্রকে ছেদ করেছেন।

৩. আচার্য - ইনি জৈন সাধু, সন্ন্যাসী বা শ্রমণ সঙ্ঘের প্রধান। কয়েকজন প্রখ্যাত আচার্য্যের নাম আমরা এক্ষেত্রে স্মরণও করতে পারি; যেমন: ভদ্রবাহু (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একজন দিগম্বর সাধু ও জৈন আগম শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান অর্জনকারী শেষ শ্রুতকেবলী), কুন্দকুন্দ (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী ও দার্শনিক), সামন্তবাহু (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকের একজন প্রখ্যাত দিগম্বর আচার্য ও সন্ন্যাসী), উমাস্বামী বা উমাস্বতী (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে

পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়কার জৈন দার্শনিক ও তাত্ত্বিক, মৌলিক গ্রন্থের লেখক; বিশেষতঃ জৈন গ্রন্থ 'তত্ত্বার্থসূত্রে'র লেখক হিসাবে সুবিদিত) ও স্থূলিভদ্র (তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী জৈন শাস্ত্রজ্ঞ)।

৪. উপাধ্যায় - ইনি জৈনশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় শিক্ষক।

৫. সাধু - ইনি সর্বত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণকারী ও জৈন সঙ্ঘে বা আশ্রমে যোগদানকারী জৈন সাধু বা সন্ন্যাসী। জৈন সাধুগণ অবশ্য দুভাগে বিভক্ত; যথা: দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর সাধু তাঁরাই যাঁরা আকাশ বা দিগন্তকে তাদের ভূষণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা পার্থিব বস্ত্র ত্যাগ করে নগ্ন সাধু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। আর শ্বেতাম্বর সাধুগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে সন্ন্যাস জীবন পরিগ্রহ করেছেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, অরিহন্ত এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সর্বোচ্চ স্তরে আরূঢ় ব্যক্তি। তিনি অসীম জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে পরম সুখ এবং পরম পবিত্র দেহ বা 'পরমউদারিক শরীর' লাভ করেছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, অরিহন্ত এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সর্বোচ্চে আরহিত ব্যক্তি। তিনি অসীম জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে পরম সুখ এবং পরম পবিত্র দেহ বা 'পরমউদারিক শরীর লাভ করেছেন।

একজন অরিহন্ত সর্বত্যাগী ব্যক্তি ও সর্বজয়ী। তিনি তপস্যা করেন, সাধনা করেন। আর, বিশ্বসংসারকে তিনি পথ দেখান। জীব ও আত্মার মুক্তি তার কাম্য। কিন্তু সব অরিহন্ত জৈনধর্ম বা জৈনপথকে নতুন ধারায় সূচিত করতে পারেন না, এতে নুতন জোয়ার বা প্লাবন নিশ্চিত করতে পারেন না। এই বিশেষ ও অভাবনীয় কাজটি করেন জৈন তীর্থঙ্করগণ। ফলে সকল জৈন তীর্থঙ্করগণই কেবলী ও অরিহন্ত, কিন্তু সকল কেবলী বা অরিহন্তই তীর্থঙ্কর নন। তীর্থঙ্কর শুধু ধর্মে নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না, তিনি জৈনধর্মকে রক্ষাও করেন। প্রতি কালচক্রে এই তীর্থঙ্করের সংখ্যা নির্দিষ্ট, আর তা চব্বিশ।

জৈনধর্মে কালচক্র দুইভাগে বিভক্ত; যথা: উৎসর্পিণী বা কালের আরোহণ ভাগ ও অবসর্পিণী বা অবরোহণ ভাগ। জৈন মতে মানুষের আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমান ইত্যাদির ঊর্ধ্বারোহন কালকে বলে উৎসর্পিণী, আর এসবের ক্রম হ্রাসমান কালকে বলে অবসর্পিণী। প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটে । এরকমই বর্তমান কালচক্রের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রথম জন ঋষভ দেব এবং শেষ জন অজিন জ্ঞাতপুত্র নাথপুত্র, যিনি নিজেকে জয় করার কারণে মহাবীর নামে খ্যাত। খৃষ্টের জন্মেরও ৬০০ বছর আগে তিনি

ইক্ষাক্ষু বংশীয় রাজা সিদ্ধার্থ ও তার রানী ত্রিশলার পুত্র হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেন। রাজপুত্র বর্ধমান নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। রাজার পুত্র হিসাবেও তিনি ন্যায়, উদারতা, ধর্ম ও করুণার আধার ছিলেন। পুরাতন জৈন সাহিত্যে তাকে ন্যায়পুত্র বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তৎকালে জম্বুদ্বীপে ব্রহ্মণ্যধর্মের অনাচার দূর করতে, আজীবক সম্প্রদায়ের নানান ধারার বিভ্রান্তি অপনোদন করতে এবং শ্রমণ আন্দোলনকে পূর্ণতা দিতে তিনি ধরিত্রীর বুকে আবির্ভূত হন। নাথপুত্র মহাবীরের কাল এখনও শেষ হয়নি। কারণ বর্তমান চব্বিশ তীর্থঙ্করের এই কালচক্র এখনও বহমান ও কার্যকর। ফলে তার দিব্যজ্যোতিতে আজো প্লাবিত হচ্ছে জম্বুদ্বীপসহ সমগ্র বিশ্বচরাচর। তার ধর্ম, জ্ঞান ও নির্দেশনা আজো জগতের ও মানব মুক্তির জন্য প্রাসঙ্গিক এ জৈনধর্মের এক স্থির বিশ্বাস।

Ahimsa in Indian Culture; A short study

Ajoy Tantubay
Ph D Research Scholar
Dept of Sanskrit
Bankura University,
West Bengal

Email: tnatubayajaygd@gmail.com
Phone: 9093028875

Key words: Ahimsa, Veda, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, Srimadbhagvadgita, Manusmriti, Jainism, Pancha-Mahavrata, Jiva, Himsa, Laity, Sadhu, Sadhvi, Mahatma Gandhi, Satyagraha.

Abstract: Ahimsa, or non-violence, stands as one of the cardinal virtues in Indian culture, deeply ingrained in its spiritual, philosophical, and ethical fabric. It has been kept in a place of highest importance. It is best reflected in the life of Jain commoners. In this paper, we have to deal with the concept of nonviolence.

Ahimsa i.e., Nonviolence is the essence of Indian civilization. From the time immemorial Non-violence has been being practiced in this land in various forms. In Indian life Ahimsa plays the pivotal role. If we take a look of the world history from the pre-historic age, we find that various nations got themselves involved in devastating wars only to acquire others' land and resources. The world has also witnessed two Crusades where one religious community tried to impose its own culture on the another. But in the history of India, we do not find such incidents excepting some minor events. In the Twentieth century some powerful nations compelled the people all over the globe to suffer from two world wars. India also was forced to join the war as it was then not an independent nation; as per the

will of the imperial ruler, India had no other option than to take part in the war. It can be emphatically said that India would not take part in those wars, if she had the scope to exercise her own will. Whenever India acquired enough military and administrative power, be in the reign of Maurya dynasty, or of the Gupta dynasty or even today, India always used her military power only to protect herself from foreign invasion and to maintain internal peace. The reason behind this stance is implied in the cultural heritage of India.

From the pre-historic age two cultures has been running parallelly in India – The Vedic culture and the Shramana culture. The actual identity of the Pashupati Yogi idol of Harappan civilization has not yet been established unanimously, but many scholars opined that it is the earliest form of Present day's Shiva, the God of destruction in Vedic belief. On the other hand, many other scholars find in it the earliest form of Rishabhnath, the very first Teerthankar of Shramanik Tradition. So, in absence of concrete evidence it cannot be stated that which opinion is more acceptable, but It leads us to assume that both the Shramana tradition and the Verdic tradition originated from the same source in Harappan period, if not earlier. Shramana tradition flourished as Jainism and Buddhism in later age and Hinduism is the evolute form of the Vedic tradition. Shraman tradition, i.e., Jainism and Buddhism give utmost emphasis on Ahimsa (non-violence). If both the traditions originated from a single source, then Ahimsa, in any form, should be found in Vedic culture, i.e., in Hinduism too.

Ahimsa finds its earliest expressions in the Vedas, where hymns emphasize peaceful coexistence and respect for all life forms. It is known to all that the earliest text of the world is Rigveda. From Veda to modern age's Hindu texts - all propagated the concept of Ahimsa. Ahimsa, or non-violence, stands as one of the cardinal virtues in Hinduism, deeply

ingrained in its spiritual, philosophical, and ethical fabric. Rooted in the belief in the interconnectedness of all life forms and the concept of karma, Ahimsa emphasizes the avoidance of harm to any living being, including humans, animals, and plants.

In the Rigveda, “May your grace be successful for us. May we not be envious. May we enjoy the fruits of your grace as people enjoy the milk of a cow”.[1] This concept of Ahimsa extends further to include not only the human beings but the non-human beings too in another place, ““The cow is the mother of the Rudras and sister of the Adityas. All the devas reside within the cow. She bears Amrita in the form of milk. So, she is adorable and not to be killed”.[2] Yajur Veda says, "Do not injure, abuse, oppress, enslave, insult, torment, torture, or kill any creature or living being."[3] In the Atharvaveda we find, "May all beings look at me with a friendly eye. May I do likewise, and may we look at each other with the eyes of a friend."[4]

In the Upanishads, ahimsa is linked to the concept of universal interconnectedness (vasudhaiva kutumbakam), highlighting the spiritual imperative to avoid harm. The Upanishadik sage utters, "One should not injure living beings, either physically or mentally. One should be truthful, kind to others, and cultivate patience."[5]

In later age, the two epic narratives of Hinduism also reflect the concept of Ahimsa. The Mahabharata and the Ramayana portray the ideals of dharma (righteousness) and ahimsa through characters like Lord Rama and Lord Krishna, who uphold non-violence even in challenging situations. The Mahabharata declares, “Ahimsa Paramo Dharma”,[6] i.e., Nonviolence is the greatest virtue. Srimadbhagvadgita, which was originally a part of the Mahabharata and now honoured as a complete sacred religious text is abundant of quotes that advise us to follow the paths of Nonviolence. One quote may be mentioned here as an example in the 13th chapter Lord

Krishna says, "Humility, unpretentiousness, nonviolence, patience, uprightness, service to the guru, cleanliness, steadiness, and self-control; dispassion toward the objects of the senses, absence of egotism, insight into the pain and evil of birth, death, old age, and sickness...".[7] Gita emphasizes the practice of Ahimsa as a duty of individuals seeking material and spiritual advancement. Lord Krishna advises Arjuna that one should not cause harm to others through thought, word, or deed, emphasizing compassion and empathy as the cornerstone of righteous conduct.

The Smriti texts are actually the guidelines of social and personal life of the Hindus. Manusmriti is a well-known such text. It says, "Ahimsa (non-violence) is the highest duty. Abstinence from injury is a great virtue."[8] (Chapter 10, Verse 63). During the medieval period, the Bhakti movement emphasized devotion and love towards God, often manifesting in peaceful coexistence and compassion towards all beings. Bhakti saints like Kabir, Tulsidas, and others emphasized the importance of ahimsa as an essential aspect of spiritual life.

The above discussion reflects that in Hinduism Ahimsa has been kept in a place of highest importance. Now let's discuss the concept of Ahimsa as per Jainism. The discussion needs to be very brief as Jainism is all about Nonviolence; Ahimsa in Jainism can take thousands of pages to be discussed. All the Jains have to follow five Vratas (vows) for ever. These five vows are – Ahimsa (Nonviolence), Satya (truthfulness), Achaurya (Non-stealing), Brahmacharya (Chastity/ Celibacy) and Aparigraha (Non-attachment).[9] If we analysis these five Vratas, it becomes clear that Ahimsa is placed in the first position as all the other 4 Vratas are necessary to protect Ahimsa. A truthful person can never be violent to others. Stealing gives birth violence. An important reason of the two violent wars that

depicted in Ramayana and Mahabharata respectively was the lust for women. And definitely non-attachment towards one's own possessions is the greatest way to block the feeling of violence in own's mind as well as in that of the others.

Here a question arises quite naturally. Is observation of complete non-violence possible in human life? Afterall, we have to take food for our survival that must cause violence to other inferior beings. To answer this question, one should have the knowledge on the concept of 'living beings' in Jainism. According to Jainism all the entities in this Nature, from water, earth, fire and air to plants and animals, have life. Earth, Water, air, fire and plants are considered as the 'Ekendriya Jiva' (living being having only one sence), worms, cunchs, etc animals are 'Dwi-indriya Jiva' (living beings having two senses), ants, bed-bugs, etc. are 'Tri-indriya Jiva' (living being having three senses), scorpion, mosquito, etc. are 'Chaturindriya Jiva' and man, domestic animals, wild animal and birds are panchendriya Jiva (living beings having all the five senses).[10] Hurting or killing ekendriya Jiva results in minimum sin and killing any panchendriya Jiva results in maximum sin. To any householder, it is impossible to survive without taking food and water. So, he has to commit sins. Jainism prescribes here to commit as least possible violence as possible. If any act of violence towards any Ekendriya Jiva is sufficient to serve the purpose, one should not commit violence against Dwi-indriya Jiva, and so on. Less violence yields less sin. And to destroy this sin the householders have to perform 12 duties including Prayaschitta. Yet their sin prevents them from attaining liberation. So, no householder Jain can attain salvation. Their journey is only to become a better soul so that adopting ascetic life they can start their journey towards the ultimate Salvation. For the Jain laity nonviolence means minimum violence, Satya means maximum feasible truthfulness,

Achaurya means not accepting anything without the permission of its owner, and Brahmacharya means remaining faithful to one's spouse.

But for the monks and nuns (Sadhu and Sadhawi) there are no concessions in performing these five vratas; they have to perform these with absolute purity, and in their case these five vows are collectively termed as 'Pancha Mahavrata'.[11] Thus the ascetics remains completely nonviolent - physically, mentally and verbally. They do not cook food and even do not accept food which are cooked specially for them. They are only allowed to accept food which is cooked in a family for the consumptions of the family members.

Details description of the conduct of Jain ascetics is irrelevant here. We have to deal with the concept of non-violence reflected in the life of Jain commoners. In Jainism, violence is classified into four categories – Arambhi Himsa, Udyogi Himsa, Birodhi Himsa and Sankalpi Himsa.[12] A jain laity is aloowed to do the first three types of Himsa (violence) as and when they are needed for their survival, but the fourth type, i.e., Sankalpi himsa is forbidden. They follow the advice "Parasparopagraho Jivanam" (All life is bound together by mutual support and interdependence).[13] This is the very reason for the vegetarian food habit of the Jains. This concept of Ahimsa has made them a peaceful and prosperous community.

Now, it is understood that in every branch of Indian culture Ahimsa is being followed as far as possible. In practical terms, ahimsa extends beyond abstaining from physical violence. It encompasses refraining from hurtful speech, thoughts, and actions. This principle encourages individuals to cultivate a mindset of tolerance, understanding, and respect for all forms of life. By practicing ahimsa, individuals seek to create harmony within themselves and with the world around them, fostering an environment conducive to peace and spiritual well-being.

This tradition of nonviolence inspired Indian rulers to remain abstained from any kind of invasion. India never sends any military invader to other countries, rather it sent religious ambassadors to many countries like Srilanka, China, Tibet etc. in different times.

In modern times, Mahatma Gandhi, a prominent proponent of ahimsa drew inspiration from these ancient Indian teachings in his philosophy of non-violent resistance (Satyagraha). His leadership in India's struggle for independence demonstrated the transformative power of ahimsa in bringing about social and political change without resorting to violence. He advised all to practice Ahimsa as far as possible, "Ahimsa is the highest duty. Even if we cannot practice it in full, we must try to understand its spirit and refrain as far as is humanly possible from violence."[14]

Eminent fighter personalities like Martin Luther King in the USA and Nelson Mandela in South Africa were highly inspired by Mahatma Gandhi, the brand ambassador of Ahimsa of modern age.

End notes:

1. Rigveda 10.22.13
2. Rigveda 8.101.15
3. Yajurveda 36.18
4. Atharvaveda 19.9.14
5. Taittiriya Upanishad 1.11.2
6. Mahabharat, Anushasan Parva, Chapter 116
7. Bhagvadgita 13. 8-12
8. Manusmriti 10.63
9. Tattvarthasutra 7.1
10. Jain Dharma Darshan, Part – 1, Adinath Jain Trust
11. Tattvarthasutra 7.2
12. Muni Pramansagar, Jain Tattvavidya -pp-151
13. Tattvarthasutra 5.21
14. www.mkganghi.org/epigrams/a.htm

Bibliography:

1. Srimadbhagvadgita, Gorakhpur Gita Press
2. Jain Tattvavidya, Muni Praman Sagar
3. Tattvarthasutra, Part-2, Adinath Jain Trust, Chennai
4. Jain Dharma Darshan; Part-1, Adinath Jain Trust, Chennai

জৈন ধারার কথা

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক,
জঙ্গলমহল এক্সপ্রেস পত্রিকা
বাঁকুড়া

"অহ দুচ্চর লাঢ়ং অচারি
বজ্জভূমিং চ শুম্ভভূমিং চ"

১. "সদা সংযমী ভগবান তৃণস্পর্শ, শীতস্পর্শ এবং উষ্ণস্পর্শজনিত পীড়া, ডাঁশ ও মশার দংশন প্রভৃতি নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেন ।

২. তিনি দুর্গম রাঢ়দেশের বজ্জভূমি ও শুম্ভভূমি নামক দুই প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপদ সংকুল স্থানে অবস্থান করিতেন এবং (বালুকা ও লোষ্ট্রাদিপূর্ণ) স্থানে উপবেশন করিতেন।

৩. সেই রাঢ় দেশে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় .....। সেই দেশের অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত। সেখানে তিনি রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্পপরিমিত ভিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, কুকুরেরা তাঁহাকে দংশন করিত ও তাঁহার উপর পতিত হইত।

৪. কুকুরেরা তাঁহাকে দংশন করিতে আসিলে অল্প সংখ্যক মুনুষ্যই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বা তাহাকে দংশন করিবার জন্য – 'ছুকছুক' শব্দে কুকুর লেলাইয়া দিত। " (নবম অধ্যায়/ উপধান শ্রুত, তৃতীয় উদ্দেশক, আচারাঙ্গ সূত্র - অনুবাদ - হীরা কুমারী বোথরা, প্রকাশক - শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা , কলকাতা) ।

অর্ধ মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই জৈন ধর্মসাহিত্যেই শুধু নয়, বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক ও পরিব্রাজকের বিবরণ, এমনকি মঙ্গল কাব্য থেকে মোগল, পাঠান ও ব্রিটিশ লেখক গবেষকদের রচনাতেও নিন্দা মন্দের কথা হয়েছে রাঢ়ভূমি ও রাঢ়বাসীদের উদ্দেশ্যে। জৈন শাস্ত্রে - লুকাদেশীয়, মহাভারত সহ বেদ পুরাণ সাহিত্যে - পক্ষীদেশীয়, মঙ্গল কাব্যে - ব্যাধ, গো হিংসক, রাঁঢ় /চুয়াড় বলা হয়েছে রাঢ়ের মানুষকে। মঙ্গলকাব্যে আরও কটুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে - "ভিল্লপ্রায় লোক

তাঁহে পরম পাষন্ড"। অর্থাৎ গভীর জঙ্গলে ঘেরা নদ- নদী বিধৌত, পাহাড়-টিলা বেষ্টিত এই দুর্গম ভূখন্ড ছিল ব্রাত্য এবং এখানকার জনপদ ও জনজীবন ছিল অস্পৃশ্য - অপাঙক্তেয়।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ব্রাত্যভূমিকে ঘিরেই তখনকার ষোল মহাজনপদ আন্দোলিত ও আলোড়িত হয়েছিল অবিশ্বাস্যভাবে। তারও প্রমাণ মেলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমকালীন ইতিহাস, পুরাণ, প্রশস্তিলিপি ও জীবনচরিত থেকে। শুধু জৈন, বৌদ্ধ সাহিত্য নয়, সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যেও যথেষ্ট উল্লেখ মেলে এই ব্রাত্যভূমির। জৈন সাহিত্য ও শাস্ত্র ছাড়াও বুদ্ধজাতক কাহিনী (বেস্ সান্তর জাতক > বিশ্বন্তর - সং) কাহিনীতেও এই 'স্ট্র্যাটেজিক জোনে'র গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ মেলে। পালিভাষায় রচিত 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশে' এর অস্তিত্ব ও গুরুত্বের কথা জানা যায় ।

আমরা জৈন সাহিত্য, জৈন পুরাণ ও শাস্ত্র পড়ে যেটুকু জানতে পারি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জৈন ধর্ম ও তার মহান প্রচারকদের নিয়ে সীমাবদ্ধ গন্ডীতেই আলোচনা করি। এর বাইরেও আছে সেই সব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলো। যেমন - ব্রহ্মাণ্ডের গঠন, সৌরজগত ও গ্রহনক্ষত্রের আলোচনা রয়েছে ভরপুর। আরও আছে সমস্ত জীব পরিমন্ডলের কাহিনী। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, মানবসংস্কৃতির উল্লেখ ছাড়াও সমাজ সংসারে পালনীয় ও আচরণীয় ইতিকর্তব্য তথা জীবহিংসা রোধের কথা বলা আছে সহজ সরলভাবে। সংক্ষেপে সেই কথাগুলোই বলে নেওয়া জরুরি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এক অভিন্ন এবং অখন্ড ছিল। এই ধারণা এসেছে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি থেকেই। বহুত্ববাদ এবং নানান মতবাদের শ্রোতধারা বয়ে চলেছে সমান গতিতে। নেগ্রিটো থেকে আদি অষ্ট্রেলিয় এবং তারপর আর্য, দ্রাবিড়, গ্রীক, মোঙ্গল, শক, হুণ, পাঠানের দেশ হয়ে উঠেছিল এই 'সোনার হিন্দুস্তান'। তার নামকরণেও আছে জৈন ধারণা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন চক্রবর্ত্তী সম্রাট ভরতের নাম থেকেই আমাদের দেশটির নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ভরত বংশীয়দের দেশ বলেই এই দেশ ভারতবর্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে । তাঁর ভাই বাহুবলী রাজছত্র ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন প্রবজ্যা। এঁরা দুজনেই ছিলেন, প্রথম ভগবান ঋষভনাথের পুত্র, পরবর্তীকালে তিনি জৈন পুরাণ ও সাহিত্যে আদিনাথ বা আদিদেব নামে অভিহিত হয়েছেন। জৈন ধর্মের অবসর্পিনী যুগে তিনিই প্রথম বা আদি তীর্থঙ্কর এর মর্যাদা লাভ করেন। জৈনধর্ম এলো কীভাবে ?

এখন এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা জরুরি। প্রথম থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল উদারতাবাদের ভিত্তিভূমি। তার প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড়টি ছিল বহু গভীরে। ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, শান্তি - মৈত্রী আর সাম্যের ধারক হিসেবে এই সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছিল বৈদিক কাল থেকেই। বিশেষ করে সিন্ধু-সরস্বতী তীরের হিন্দু সংস্কৃতিটি ছিল একটি বিশালাকার জনগোষ্ঠী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যার মূলতত্ত্ব হলো সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও অখন্ড মতবাদ, বৈদিক যুগ পেরিয়ে যে মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - ভারতীয়ত্ববোধ বা ভারতত্ব নামে এক এবং অভিন্ন মতবাদ। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকা থেকে। তাই হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিরোধ নেই আজও। একেবারে আদিতে জৈনধর্মের প্রচারপ্রসার কালে মূর্তি ও দেউলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বলে জৈন শাস্ত্রেই উল্লেখ মেলে (দ্রষ্টব্য : জৈন দেবকুল কী বিকাশ, তৃতীয় অধ্যায়, জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান - ড: মারুতি নন্দন প্রসাদ তিওয়ারি, প্রকাশক - পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান ,বারানসী)। বৈদিক মতের সঙ্গে মতপার্থক্য ও মতবিরোধ থেকেই দুটি স্বতন্ত্র অহিংস ও বিরুদ্ধ (প্রতিবাদী) মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । যার মধ্যে জৈন মতবাদ হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁরা বেদবিরোধী (বেদ, উপনিষদ) ছিলেন না। বরং বেদের 'কর্তৃত্ববাদ' মেনে নিতে পারেননি । এবিষয়ে দুটি অভিমতের উল্লেখ জরুরি। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুর্কহাইম (Emile Durkheim) বলেছেন - "..... if this indifference for the divine is developed to such a point in Buddhism and Jainism, it is because it's germ existed already in the Brahmanism from which the two were derived". (The Elementary Forms of Religious Life, p. 33)

অর্থাৎ দেবী দেবতা সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতে যে ঔদার্য বা উদাসীনতা দেখানো হয়েছে তার আদি বীজ বা শেকড় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে নিহিত ছিল। একই কথা বলে গেছেন ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন - "বুদ্ধদেব নতুন কোন ধর্মমত সৃষ্টি করেননি। তাঁরা বরং পুরানো নীতি - আদর্শকে নতুন করে আবিস্কার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন..... পুরানো ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে তাকে নতুন করে রূপদান করেছেন"। (Indian philosophy, vol.1, pp. 360-61).

ড: রাধাকৃষ্ণণ নিজে রিজ ডেভিডস ও ওল্ডেনবার্গের মতকে জোরালো সমর্থন করেছেন। রিজ ডেভিডস বলেছেন -"গৌতম হিন্দু হয়েই জন্মেছিলেন ও লালিতপালিত হয়েছিলেন,

হিন্দুরূপেই জীবনযাপন করেছিলেন ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। গৌতমের তত্ত্ববিদ্যা ও নীতিসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত এমন কিছু ছিল না, যা কোন না কোন বেদানুগামী শাস্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, এবং তাঁর নৈতিক আদর্শের অনেকাংশ প্রাচীন অথবা পরবর্তী গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত হতে পারত। অন্যের দ্বারা সম্যকরূপে উক্ত বিষয়কে তিনি যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, পরিবর্ধিত করেছিলেন, মহনীয় করে তুলেছিলেন এবং একটি সুসংবদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন - যেভাবে কয়েকজন প্রখ্যাত হিন্দুচিন্তাবিদ্ কর্ত্তৃক স্বীকৃত সাম্য ও ন্যায় পরায়ণতার নীতিকে তিনি তাদের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিলেন - তার মধ্যেই ছিল তাঁর মৌলিকতা। তাঁর গভীর আন্তরিকতা এবং বিশ্বপ্রেমিকতার উদার সামাজিক মনোভাবেই প্রধানতঃ অন্যান্য আচার্যের সঙ্গে ছিল তাঁর পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল"। (Buddhism, pp, 83-84).

এরই পাশাপাশি বলতেই হয় জৈন ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রারম্ভিক ইতিহাসের কথা। প্রতিবাদী ধর্মমত বা অহিংস মতবাদ কেন হলো ? বৈদিক সভ্যতায় আর্যদের দ্বারা বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও সংস্কারের প্রচলন ঘটে। চূড়ান্ত ধাপে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়ামি, যাগযজ্ঞসর্বস্বতা, পশুহত্যা, বলিদান, রক্তপাত, হিংস্রতা, গোষ্ঠী সংঘর্ষের প্রতিবাদেই বিরুদ্ধ মতবাদের জন্ম হয়। এই ধর্মমতটি ছিল নাস্তিক দর্শনের মতোই। এখানে বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হয়েছে দ্ব্যার্থহীনভাবে। এই রকমই একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রিয়কে জয় করার মাধ্যমে সিদ্ধত্ব বা মোক্ষ অর্জন করা। এই ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠা করার একনিষ্ঠ সাধনায় একদল জৈনমুনি - তীর্থঙ্কর প্রবজ্যা গ্রহন করেছিলেন । জৈন শ্রমণ ও তীর্থঙ্করদের ধর্মের মূল প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয় । আবার 'জৈন' কথাটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে। সংস্কৃত 'জি' ধাতুর অর্থ হলো জয় করা । অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিজের উপর কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব অর্জন করতে পেরেছেন, তিনিই জিন, এবং জিনের উপাসকই জৈন। আবার 'তীর্থঙ্কর' শব্দবন্ধটির অর্থ হলো পায়ে হেঁটে যিনি বা যাঁরা অলঙ্ঘ্যনীয় পথ পেরিয়ে যান। জৈন শাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'সংসার সমুদ্রের পথপ্রদর্শক'।

আমরা জৈন সাহিত্য ও জৈন পুরাণ থেকে বেশ কিছু মৌলিক তথ্যসূত্র পাই । এই ধর্মমতের দুই শাখাতেই তথ্যসূত্র ভীষনভাবে প্রযোজ্য। বৈদিক নিয়ম, আচারঅনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুশাসন সহ বিভিন্ন বিষয় প্রভাবিত করেছে জৈনধর্মকে। এই ধর্ম ও সাহিত্য রচিত হয়েছে

মুলতঃ অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায়। এছাড়াও শৌরসেনী প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং সংস্কৃত ভাষায়ও বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়।

জৈন সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল এই পথ ধরেই। যেমন - আচারাঙ্গ সূত্র, ভগবতী সূত্র ও কল্পসূত্র থেকে একটি মৌলিক রূপরেখা পাওয়া যায়। জৈন ধর্ম সংস্কৃতির ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ ১১টি অঙ্গ, ১২ টি উপাঙ্গ, ১০ টি পৈন্ন, ৬ টি ছেদসূত্র , ৪টি মূলসূত্রের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিল।প্রতিটি বিভাগে বিশেষ বিশেষ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

অঙ্গ - জৈন সাধু সন্ন্যাসীদের আচরণ, সত্য ও অসত্যের ধারণা, উদ্দীপনামূলক বিষয় উল্লিখিত আছে।

উপাঙ্গ - ভৌগোলিক ধ্যানধারণা, চন্দ্রসূর্য ও পাতাল সংক্রান্ত এবং ভগবান মহাবীরের উপদেশসমূহ নিয়ে আলোচনা আছে ।

পৈন্ন বা প্রকীর্ণক - শৃঙ্খলা, নৈতিক নিয়মাবলী, মানবদেহের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

এমনই আরও অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই সমস্ত জৈন সাহিত্য ও পুরাণে।

পরবর্তীতে আলোচনার সুযোগ বা পরিসর মিললে একটি সুসংহত ও বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরার ইচ্ছা রইলো।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থঋণ:
১) আচারাঙ্গ সূত্র - (অনুবাদ) হীরাকুমারী বোথরা,শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা, কলকাতা
২) জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান - ড: মারুতিনন্দন প্রসাদ তেওয়ারী, পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান, বারানসী।
৩) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্ দর্শন : সুনীল কুমার দাস ।
ব্যক্তিঋণ:
১) ড: সুভাষ রায়,চেলিয়ামা, পুরুলিয়া ।
২) ড: অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

आओ, चलो लौट चलें

(सराक समुदाय की अपनी मूल प्राचीन संस्कृति की ओर वापसी यात्रा पर एक शोध पत्र)

सुखमय माजी
पीएचडी रिसर्च स्कॉलर
प्राकृत और जैन विभाग
एकलव्य विश्वविद्यालय
दमोह, मध्य प्रदेश

ई-मेल: joyhind.joybharat@gmail.com
फोन & व्हाट्सएप: 9434931397

कीवर्ड्स: सराक, संस्कृति, जैनधर्म, मंगलबिजयजी, ज्ञानसागरजी, जीवनशैली, रीति-रिवाज, विहार, चातुर्मास, श्वेतांबर, दिगंबर।

सार: यह लेख भारत में सराक जाति के इतिहास पर चर्चा करता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में उनकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। इस क्षेत्र में प्राचीन जैन समुदाय को फिर से खोजने और सरक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए विभिन्न श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदायों के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। लेख में सराक रीति-रिवाजों और जैन घरेलू जीवन शैली के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया गया है, जो जैनधर्म से उनके संबंध को मजबूत करता है। मुनि श्री मंगलबिजयजी महाराज और आचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज के योगदान का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह लेख दिखाता है कि कैसे यह समुदाय धीरे-धीरे अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनः प्राप्त कर रहा है।

बंगाल में कई जातियों के लोग रहते हैं। लगभग सभी जाति और जनजातियों के नाम विभिन्न धार्मिक साहित्य या समाजशास्त्रीय साहित्य में पाए जाते हैं; केवल एक ही अपवाद है। यह उस जाति के बारे में है, जिस पर यह लेख चर्चा करेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से यदि हम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ें तो बांकुड़ा, पश्चिम वर्धमान और पुरुलिया होते हुए झारखंड पहुंचेंगे। इन

तीन जिलों और झारखंड के सिंहभूम, रांची और दुमका जिलों में एक ऐसा समुदाय निवास करती है, जो अपना इतिहास खो चुका है. उनके निजी दस्तावेजों में उनका उल्लेख हिंदू के रूप में किया गया है, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था में उनका कोई उल्लेख नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्हें धीरे-धीरे हिंदुओं की जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा । न केवल उनके पड़ोसी, बल्कि वे स्वयं भी अपने को शूद्र मानते हैं। यदि आप उनकी जाति का नाम जानना चाहें तो वे अपना परिचय 'सराक' के रूप में देते हैं। अब यदि कोई उनकी जाति के बारे में विस्तार से जानना चाहता है, तो वह कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि यह 'सराक' नाम दूसरों के लिए अपरिचित है। इसलिए समझाने में समय लगता है और उन्हें समझाना असंभव हो जाता है क्योंकि स्वयं उन्हें भी इसके बारे में कोई स्पष्ट और विस्तृत जानकारी नहीं है। हालाँकि, अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है।

दिलचस्प बात यह है कि जिन स्थानों पर ये 'सराक' लोग रहते हैं, वे जैन शाश्वत तीर्थस्थलों में से एक सम्मेदशिखर से ज्यादा दूर नहीं हैं। फिर, उनके खान-पान से लेकर उनके रहन-सहन तक सब कुछ जैन श्रावकचार से मेल खाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है किकी इनके पूर्बज अबश्य ही जैन धर्मी थे। यद्यपि प्रख्यात इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि बंगाल का सबसे प्राचीन आर्य धर्म जैनधर्म था,[1] फिर भी बांग्लादेश में जैन इतिहास का अध्ययन बौद्धधर्म पर शोध की मात्रा की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं हुई है, वह धर्म जो जैन धर्म के तुरंत बाद बंगाल पर हावी हो गया था।[2] परिणामस्वरूप, बंगाल के जैन इतिहास के कई विवरण अज्ञात रह गए हैं। उस अज्ञात इतिहास का अध्ययन बहुत बाद में श्वेतांबर मुनि मंगलबिजयजी महाराज,[3] दिगंबर मुनि आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज[4] और कलकत्ता के जैन भवन[5] के प्रयासों से शुरू हुई। और परिणामस्वरूप इस समुदाय के गौरवशाली इतिहास के कुछ अंश सामने आये हैं।

इस लेख में उन सभी खंडित चित्रों को एक 'चित्र पहेली' ('पिक्चर पज़ल') की तरह एक साथ रखकर इस 'सराक' जाति के इतिहास की लगभग पूरी तस्वीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उससे पहले यहां के सराक-बहुल इलाकों के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सराक-बहुल गांवों की संख्या बांकुरा जिले में 31, पुरुलिया जिले में 88, पश्चिम बर्दवान जिले में 27 और बीरभूम जिले में 3 है। झारखंड में 96 सराक गांव हैं. इनमें सिंहभूम जिले में 6, रांची जिले में 47, दुमका जिले में 30, धनबाद जिले में 3 और बोकारो जिले में 10 गांव शामिल हैं। सराक लोग उड़ीसा के कटक जिले में 49, नोवागढ़ जिले में 25, गंजम जिले में 22, पुरी जिले में 29 और गुजम जिले में 6 गांवों में रहते हैं। कुल मिलाकर भारत में लगभग 20000 'सराक' परिवार हैं।[6]

आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व गुजरात के पालीताणा से मुनि श्री मंगलबिजयजी महाराज शिखरजी पधारे थे। यहां आकर उनके मन में प्रश्न उठा, यह एक शाश्वत तीर्थस्थल है, जहां 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया,[7] तो इस क्षेत्र में निश्चय ही किसी जैन जाति का वसति रहा होगा। नहीं तो इस तीर्थस्थल की देखरेख कौन करते आ रहे थे? उन्होंने पूछताछ की, और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि इस क्षेत्र के सभी जैन बहुत बाद में व्यापार करने के लिए गुजरात और राजस्थान से यहां आए थे। यहां कोई मूलनिवासी जैन समुदाय नहीं है। उसे लगा कि ऐसा होना असंभव है; निश्चित ही इस क्षेत्र में प्राचीन जैन समुदाय रहा होगा। उन्होंने शपथ ली कि वह उन्हें ढूंढ निकालेंगे; यदि उन्हें ऐसा कोई समुदाय नहीं मिला, तो वह पलिताना नहीं लौटेंगे; वह सदैव इस कार्य में लगे रहेंगे। उन्होंने शिखरजी की तलहटी में मधुबन में डेरा डाला और विभिन्न लोगों से बातचीत कर अपनी लक्षित आबादी की खोज जारी रखी। शिखरजी से 28 किमी दूर गिरिडी में एक मारवाड़ी व्यापारी की दुकान पर बैठकर बातचीत करने के दौरान

उन्होंने यूँ ही पूछ लिया कि क्या आसपास कोई प्राचीन जैन बस्तियाँ हैं। व्यापारी ने कहा कि उसे ऐसी किसी जाति के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी दुकान पर पड़ोसी जिले बोकारो के विभिन्न गांवों से कुछ ग्राहक आते हैं, जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। इससे अधिक वह कुछ नहीं बोल सके। मंगलबिजयजी महाराज को इसमें आशा की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने उस गाँव के लोगों से बात की और पता चला कि वे जाति से 'सराक' हैं। उन्होंने उनके जीवनशैली के बारे में पूछताछ की और पाया कि वे अपने दैनिक जीवन में जिन रीति-रिवाजों[8] का पालन करते हैं, वह जैन घरेलू जीवनशैली के साथ बहुत मिलता जुलता हैं। फिर भी, वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सके। उन्हें तभी यकीन हुआ जब उन्होंने उनकी 'गोत्र' पूछी। उन्होंने उन लोगों से पूछा, "आप लोगों का 'गोत्र' क्या है"? तो सभी ने बताया कि उनका गोत्र 'आदिदेव' है और उनके कई रिश्तेदारों का गोत्र 'ऋषिदेव' है। इसके बाद मंगलबिजयजी के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि ये वही लोग है जिनके पूर्वज जैन श्रावक के रूप में सम्मेदशिखरजी की पूजन और देखरेख करते थे। पुष्टि के बाद वह 'बेलुट' गांव उपस्थित हुए। वहां उन्होंने एक घर में आश्रय ली। उन्होंने वहां करीब डेढ़ महीने तक रहे तथा इस दौरान उस क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि वे वास्तव में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के वंशज हैं। इस ऐतिहासिक सत्य को वे अपने 'गोत्रनाम' में वहन करते आ रहे हैं। 'आदिदेव' गोत्र वास्तव में आदिनाथ के साथ उनके संबंध को पुष्टि करता है और 'ऋषिदेव' गोत्र भी उनके साथ उनके संबंध को ही सूचित करता है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव है। ऋषभदेव से ऋषिदेव। ये दोनों अधिकांश सराकों के गोत्र' हैं। इसके अलावा सराकों के एक छोटे से भाग में पाए जाने वाले दो या चार गोत्रों का कारण अन्यत्र वर्णन किया जायेगा. इस निबंध में वह वर्णन अप्रासंगिक है।[9] उनकी बातों से कई लोग प्रभावित हुए। लेकिन तब तक वे खुद को हिंदू समझने के आदी हो चुके थे। परिणामस्वरूप मंगलबिजयजी को सामाजिक विरोध का भी

सामना करना पड़ा। कुछ परिवार अपनी हृत संस्कृति को पुनर्जीवित करने के हित में मंगलविजयजी की मदद के लिए आगे आए। लेकिन उनकी बात की सच्चाई हर कोई समझ गया, क्योंकि मंगलविजयजी द्वारा बताया गया श्रावकाचार उनकी जीवनशैली से पूरी तरह मेल खाता है। इस नये कार्य में द्विजपद माझि, राखहरि माझि, अहलाद माझि, जानकीनाथ माझि आदि परिवार आगे आये। द्विजपद माझि ने अपना सात वर्षीय पुत्र अमरेन्द्र को मंगलविजयजी को सौंप दिया।[10] स्थानीय सराक समाज का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। कुछ परिवारों को स्थानीय समुदाय से बाहर कर दिया गया; बहिष्कार किया गया। फिर भी वे अपने काम में लगे रहे। मंगलबिजयजी ने उनमें से तीस बच्चों और किशोरों का चयन किया और उनकी शिक्षा के लिए वे उनको लेकर मधुबन चले गये। वे मधुबन में धर्ममंगल विद्यापीठ की स्थापना की। बाद में जो छात्र यहाँ अच्छी पढ़ाई किये, उनकी उच्चशिक्षा के लिए मद्रास में पढ़ने की व्यवस्था की। मंगलविजयजी महाराज के प्रयासों से उस समय 10 विद्यार्थियों ने मद्रास में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे वापस लौट आए और मंगलविजयजी के मिशन के प्रमुख मिशनरी के रूप में काम करने लगे; मुख्य रूप से वे शिक्षण पेशे में लगे रहे। बाद में मंगलविजयजी ने पालीताणा से अपने शिष्य प्रभाकरविजयजी महाराज को बुलाये और दोनों ने मिलकर सराक जाति को जैन समाज की मुख्यधारा में वापस लाने में भगीरथ की भूमिका निभाई। सराक क्षेत्र में अपना पूरा जीवन बिताने के बाद दोनों का वहीं निधन हो गया।[11]

यहां उल्लेखनीय है कि ये दोनों मुनि श्वेतांबर समुदाय के थे। इसी बीच 'बेलुट' गांव में एक दिगंबर मुनि आये।[12] शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्हें लगभग डेढ़ माह तक वहीं रहना पड़ा। उनके प्रभाव से सराकों में दिगंबर मत प्रचलित हुआ, यद्यपि नगण्य मात्रा में। लेकिन सराकों के आध्यात्मिक और सांसारिक विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाले दिगंबर मुनि आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज थे। जैसे रामचन्द्र ने अहल्या का श्रापमोचन कर उनका

उद्धार किये थे, उसी प्रकार आचार्य ज्ञानसागरजी ने आत्म-विस्मृति का श्राप तोड़कर सराकजाति का उद्धार किया। इसीलिए उन्हें 'सराकोद्धारक' के नाम से जाना जाता है, और एक विशाल क्षेत्र में सराक समुदाय के लोग उन्हें 'सराकों के राम' के रूप में सम्मान देते हैं। यहां उस इतिहास का जिक्र करना जरूरी है।

सराक जाती के बिषय में जब जैन समाज को थोड़ी बहुत जानकारी मिली, तब दिगंबर समाज भी उनके आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की प्रयास सुरु की। पहला 'सराक सम्मेलन' दिगंबर जैन समाज की पहल पर 3 मई 1992 को बिहार के हज़ारीबाग़ में आयोजित किया गया था।[13] सराकों के लिए दिगंबर समुदाय का यह पहला प्रभावी प्रयास था। अगले वर्ष उपाध्याय ज्ञानसागरजी ने चातुर्मास राँची जिले के सराक क्षेत्र के तड़ाइ नामक स्थान पर बिताया। उनका विहार और चातुर्मास जैन समाज के इतिहास में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घटना के रूप में चिह्नित किये जाने योग्य है। सराकों के अपने मूल धर्म और संस्कृति से विमुख होने का एकमात्र कारण यह था कि यहां सदियों से किसी मुनि महाराज का विहार नहीं हुआ था। हालाँकि भगवान महावीर के आगमन से पहले भी बंगाल में जैन प्रभाव था,[13] यह क्षेत्र दिगंबर मुनिओं के विहार के लिए उपयुक्त नहीं था। यहां तक कि भगवान महावीर को भी यहां काफी यातनाएं सहनी पड़ी थीं।[14] इसलिए किसी भी दिगंबर संत का विहार करना यहां आसान बात नहीं थीं। ज्ञानसागरजी ने इस चुनौती को स्वीकार किये और आगे आये। वह आधुनिक समय में इस क्षेत्र में पूर्ण विहार करने वाले पहले दिगंबर मुनि हैं। उनकी विहार 1992 में शुरू हुई। 15 जनवरी 1993 को उन्होंने बुंडू नामक गांव में प्रवेश किया।[15] उन्होंने रांची, खूँटी और सिंहभूम जिलों के सभी सराक गांवों का दौरा किया। उनके विहार के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को दिगंबर श्रमणाचार और श्रावकाचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। फिर उसी वर्ष मार्च 14 को महाराज की उपस्थिति में 50 किशोरों और युवाओं के साथ पांगुरा गांव में

एक धार्मिक शिविर आयोजित किया गया।[16] जिस तरह अमरेंद्र बाबू जैसे युवा मंगलबिजयजी के मिशन के लिए मिशनरी के रूप में काम करते थे, उसी तरह ये पचास युवा भी ज्ञानसागरजी के मिशनरी के रूप में काम करने लगे। फिर जून माह में ज्ञानसागरजी का चातुर्मास तड़ाइ गांव में शुरू हुआ। उन पचास युवाओं के अथक प्रयासों ने इस चातुर्मास को इतना प्रभावशाली बना दिया कि तड़ाइ पूरे भारत के जैन समुदाय के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। अपरिग्रही दिगंबर मुनि की कठोर लेकिन सरल जीवनशैली का सराक समुदाय पर सीधा प्रभाव पड़ा। अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त करने में उनकी रुचि काफी बढ़ गई। इस रुचि को कायम रखने के लिए ज्ञानसागरजी की प्रेरणा से विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुछ सुव्यवस्थित और सुनियोजित कार्यक्रम हाथ में लिए गए। 'भारतीय दिगंबर सराक ट्रस्ट', 'सराक उत्थान समिति गाजियाबाद', 'सोसाइटी फॉर सराक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, मेरठ ' आदि संगठन बनाए गए।[17] पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में काम का प्रबंधन करने के लिए रघुनाथपुर में मंदिर और कार्यालय स्थापित किया गया। झारखण्ड और उड़ीसा में भी कार्यालय स्थापित किये गये। 2009 तक, पुरुलिया, बांकुड़ा और राची में 12 नए जैन मंदिरों की निर्माण की गई और चार मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। 16 इसके अलावा, बर्धमान जिले में पुचड़ा मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। 1992 से लेकर आज तक ज्ञानसागरजी की प्रेरणा से हर साल कई 'सराक सम्मेलन' आयोजित किये जाते हैं, ताकि सराकों का अपने धर्म के प्रति लगाव बरकरार रह सके। बच्चों और किशोरों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने हेतु पुरुलिया में 16 और बांकुड़ा में 15 पाठशालाएँ खोली गईं। हालाँकि, यह पाया गया है कि संसाधन की कमी के कारण ये पाठशालाएँ प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं।[18]

जैसे सराक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नए दिगंबर जैन मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं, वैसे ही कई श्वेतांबर जैन मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। बांकुड़ा जिले में

1, बर्धमान जिले में 1, पुरुलिया जिले में लगभग 25 और झारखंड में 10 से अधिक नए श्वेतांबर जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इनमें से सबसे सुंदर 'संखेश्वरपुरम तीर्थ' है और सबसे पुराना शालकुंडा जैन मंदिर है।[19] यहां काम करने वाले श्वेतांबर ट्रस्टों में आचार्य सुयश सूरी महाराज से प्रेरित 'अखिल भारतवर्षीय सराक संगठन', नररत्न सूरी महाराज से प्रेरित 'बर्धमान सिद्धि परिवार', 'मुनिमोहन फाउंडेशन', 'राख्यानजिर ट्रस्ट' और 'सराक प्राचीन जैन महासंघ' शामिल हैं।

निबन्धकार ने खुद देखा है कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में दिगंबर समुदाय की गतिविधियां ज्यादा उल्लेखनीय हैं और पुरुलिया जिले में श्वेतांबर समुदाय की। सराक जाति के कई लोग श्वेतांबर मुनि बन गए, जैसे आचार्य सुयश सूरी महाराज, आचार्य मुक्तिप्रभ महाराज, आदि। लेकिन इस जाति से दिगंबर मुनि का कोई उदाहरण अभी भी नहीं है। दोनों समुदायों के प्रयासों से, सराक जाति कुछ शताब्दियों के बाद धीरे-धीरे अपना गौरव पुनः प्राप्त कर रहा है; लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

अन्त्यटीप्पनी:

1. राय नीहाररञ्जन; बाङालिर इतिहास (आदिपर्ब); पृष्ठा – 358 & 501
2. बांलादेश मुक्त बिश्वबिद्यालय; बौद्ध धर्मेर इतिहास; पृष्ठा – 218
3. मुनि श्री शीलप्रभ महाराज के साथ एक साक्षात्कार 17/01/2022
4. ब्रह्मचारी मनीष भैया के साथ एक साक्षात्कार 21/05/2018
5. डॉ. लता बोथरा के साथ एक साक्षात्कार 13/05/2022
6. सुनील जैन 'सञ्चय'; सराक क्षेत्र; एक दृष्टि; पृष्ठा – 40
7. डः हुकुमचन्द भारिल्ल; शाश्बत तीर्थधाम सम्मेदशिखर; पृष्ठा – 9
8. सुनील जैन 'सञ्चय'; सराक क्षेत्र; एक दृष्टि; पृष्ठा – 8 & 9
9. श्री उज्ज्वल माझी, पोस्टमास्टर, गंगाजलघाटी के साथ एक साक्षात्कार 16/10/2023 को
10. श्री सरोज माझी के साथ एक साक्षात्कार, बेलुत 13/05/2022
11. मुनि श्री शीलप्रभ महाराज के साथ एक साक्षात्कार दिनांक 17/01/2022
12. श्री सरोज माझी के साथ एक साक्षात्कार, बेलुत वन 13/05/2022
13. सुनील जैन 'सञ्चय'; सराक क्षेत्र; एक दृष्टि; पृष्ठा – 19

14. भट्टाचार्य, डः जगत्राम; आचाराङ्ग सूत्र, पृष्ठा –
15. श्री गौरांग माझी, रघुनाथपुर के साथ एक साक्षात्कार 13/05/2022
16. ब्रह्मचारी मनीष भैया से साक्षात्कार - 21/05/2018
17. सुनील जैन 'सञ्चय'; सराक क्षेत्र; एक दृष्टि; पृष्ठा – 35 -36
18. मई, 2023 में बांकुरा और पुरुलिया जिलों के सरक- गांवों में क्षेत्र का दौरा
19. श्री संदीप माजी, सचिव, सराक प्राचीन जैन महासंघ के साथ एक साक्षात्कार 17/08/2022

ग्रन्थपञ्जी

१। राय, डः नीहाररञ्जन; बाङालिर इतिहास आदिपर्ब
२। भारिल्ल, डः हुकुमचन्द ; शाश्बत तीर्थधाम सम्मेदशिखर
३। जैन, सुनील सञ्चय; सराक क्षेत्र एक दृष्टि
४। भट्टाचार्य, डः जगतराम; आचाराङ्ग सूत्र

আগম পাঠ: ভগবতীসূত্র

শ্রীকান্ত জৈন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(সূত্র ৫/২)

এএ ণং ভংতে! নব পদা কিং এগট্ঠা নাণাঘোসা নাণাবংজণা উদাহু নাণট্ঠা নাণাঘোসা নাণাবংজণা?

গোয়মা! চলমানে চলিতে, উদীরিজ্জমাণে উদীরিতে, বেইজ্জমাণে বেইএ, পহিজ্জমাণে পহীণে - এএ ণং চত্তারি পদা এগট্ঠা নাণাঘোসা নাণাবংজণা উপ্পন্নপক্খস্স। ছিজ্জমাণে ছিন্নে, ভিজ্জমাণে ভিন্নে, ডজ্ঝমাণে ডড্ঢে, মিজ্জমাণে মড়ে, নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে - এএ ণং পংচ পদা নাণট্ঠা নাণাঘোসা নাণাবংজণা বিগতপক্খস্স।

-:শব্দশঃ অর্থ:-

এএ (সম্বোধনসূচক অব্যয়) ণং ভংতে (ভগবান)! নব পদা (নয়টি পদ) কিং (কি) এগট্ঠা (একার্থ) নাণাঘোসা (নানা ঘোষ বিশিষ্ট) নাণাবংজণা (নানা ব্যঞ্জন বিশিষ্ট) উদাহু (অথবা) নাণট্ঠা (নানার্থ) নাণাঘোসা (নানা ঘোষ বিশিষ্ট) নাণাবংজণা (নানা ব্যঞ্জন বিশিষ্ট)?

গোয়মা (হে গৌতম)! চলমানে চলিতে, উদীরিজ্জমাণে উদীরিতে, বেইজ্জমাণে বেইএ, পহিজ্জমাণে পহীণে – এএ (এই) ণং চত্তারি (চার) পদা (পদ) এগট্ঠা (একার্থ) নাণাঘোসা নাণাবংজণা উপ্পন্নপক্খস্স (উৎপন্নপক্ষের সাপেক্ষে)। ছিজ্জমাণে ছিন্নে, ভিজ্জমাণে ভিন্নে, ডজ্ঝমাণে ডড্ঢে, মিজ্জমাণে মড়ে, নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে - এএ ণং পংচ (পাঁচ) পদা নাণট্ঠা (নানার্থ) নাণাঘোসা নাণাবংজণা বিগতপক্খস্স (বিগতপক্ষের সাপেক্ষে)।

-:সরলার্থ:-

হে ভগবান! এই নয়টি পদ কি নানা ধ্বনি ও নানা ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট একার্থবাচী পদ, নাকি নানা ধ্বনি ও নানা ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট নানার্থবাচী পদ?

হে গৌতম! চলমানে চলিতে, উদীরিজ্জমাণে উদীরিতে, বেইজ্জমাণে বেইএ, পহিজ্জমাণে পহীণে – এই চারটি পদ উৎপন্নপক্ষের সাপেক্ষে নানা ধ্বনি ও নানা ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট একার্থবাচী পদ। এবং ছিজ্জমাণে ছিন্নে, ভিজ্জমাণে ভিন্নে, ডজ্ঝমাণে ডড্ঢে, মিজ্জমাণে মডে, নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে – এই পাঁচটি পদ বিগতপক্ষের সাপেক্ষে নানা ধ্বনি ও নানা ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট নানার্থবাচী পদ।

এই পঞ্চম সূত্রের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে কর্মবন্ধের ক্রমশঃ নাশ হওয়ার ক্রমশঃ প্রক্রিয়া সম্বন্ধিত নয়টি প্রশ্ন এবং তাঁদের উত্তর এবং দ্বিতীয় অংশে এই নয়টি কর্মবন্ধননাশক প্রক্রিয়ার একার্থক বা নানার্থক হওয়ার বিষয়ে প্রশ্নোত্তর রয়েছে। বিশেষাবশ্যক ভাষ্যে শ্রাবস্তী নগরে প্রাদুর্ভূত 'বহুরত' নামক নিহ্নব দর্শনের প্রবর্তক জামাইল্ল বিষয়ে বর্ণন আছে। জামালির মত ছিল যে, যে কার্য করা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'করা হয়েছে' একথা বলা যাবে না; বললে তা মিথ্যাভাষণ হবে।এই রকমের তদানীন্তন প্রচলিত বিভিন্ন মত সম্বন্ধে শ্রী গৌতমস্বামী দ্বারা এই সব প্রশ্ন সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে ভগবান মহাবীরকে করা হয়েছিল। ভগবান মহাবীরের প্রতিপাদিত দর্শন অনুযায়ী, যে কাজ শুরু করা হয়েছে, তাতেও তো কিছু কাজ করা হয়েছে; নিশ্চয় নয় অনুসারে এটাই মানা উচিত।

এখানে চলন, উদীরণা, বেদনা, প্রহাণ, ছেদন, ভেদন, দগ্ধ, মৃত, নির্জীর্ণ, ইত্যাদি পদগুলি একটু আলোচনার অবকাশ রাখে। কর্মদলের উদয়াবলিকার জন্য এক স্থান থেকে আরেক স্তানে যাওয়াকে চলন বলা হয়। কর্মের স্থিতি পরিপক্ক হওয়ার পর সেই কর্মের উদয় হওয়ার আগেই বিশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা সেই কর্মগুলিকে টেনে আনাকেই বলা হয় উদীর্ণা। উদায়াবলিকায় আসা কর্মের ফলকে অনুভব করার নাম বেদন বা বেদনা। যে করমগুলি আত্মপ্রদেশের সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে, তাঁদের দূর করা বা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার পদ্ধতিই হল প্রহাণ। অপবর্তনার দ্বারা কর্মের দীর্ঘকালীন স্থিতিকে স্বল্পকালীন স্থিতিতে নিয়ে আসার নাম ছেদন। বদ্ধ কর্মের তীব্র রসকে অপবর্তনার দ্বারা মন্দ রসে পরিণত করা অথবা মন্দ রসকে তীব্র করার নাম ভেদন। দহন বলতে বোঝায়, কর্মরূপ কাষ্ঠকে ধ্যানাগ্নির সাহায্যে জ্বালিয়ে অকর্মে পরিনত করা। পূর্ববদ্ধ আয়ুষ্য কর্মের নাশ কে বলা হয় মরণ। যার এইরূপ আয়ুষ্য কর্মের নাশ হয়েছে, তাঁকে মৃত নামে অভিহিত করা

হয়। ফল দেওয়ার পর আত্মা থেকে কর্মের পৃথক হয়ে যাওয়ার নাম নির্জরা। যাঁদের বিষয় একই রকম অথবা যাঁদের অর্থ একই প্রকার তাঁদের বলা হয় একার্থ (একার্থবাচী)।

এবার দেখি, "হে গৌতম! চলমানে চলিতে, উদীরিজ্জমাণে উদীরিতে, বেইজ্জমাণে বেইএ, পহিজ্জমাণে পহীণে" – এই বাক্যের দ্বারা ভগবান চলন, উদীর্ণা, বেদন এবং প্রহাণ, এই চারটি পদকে একার্থ কেন বললেন। আসলে এই চার ক্রিয়ার স্থিতিকাল সমান (এক অন্তর্মুহূর্ত), এগুলি সবই গত্যর্থক এবং এরা একই কার্যের সাধকঃ এঁদের কাজ কেবলজ্ঞানকে প্রকট করা। এই সব কারণের এঁদের একার্থ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

"ছিজ্জমাণে ছিন্নে, ভিজ্জমাণে ভিন্নে, ডজ্ঝমাণে ডড্ঢে, মিজ্জমাণে মড়ে, নিজ্জরিজ্জমাণে নিজ্জিণ্ণে"- এই বাক্যাংশ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ছেদন, ভেদন, দহন, মরণ এবং এবং নির্জরা – এই পাঁচটি পদ হল বস্তুর বিনাশের সাপেক্ষে ভিন্নার্থক। স্থিতিবন্ধের সাপেক্ষে ছেদন, অনুভাগ বন্ধের সাপেক্ষে ভেদন, প্রদেশবন্ধের সাপেক্ষে দহন, আয়ুকর্মের সাপেক্ষে মরণ এবং সমস্ত কর্মের সাপেক্ষে নির্জরার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই পাঁচ পদ ভিন্নার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়।

(ক্রমশঃ)